"কাঁদতে আসিনি––ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি"

মোঃ জানে আলম*

দারিদ্রক্লিষ্ট-মলিনবসনা-কিশোরী–তরুণী–সদ্যযৌবণা-হৃতলাবণ্য–নবপরিণিতা–সন্তানসম্ভবা শত সহস্র নারী– নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে -- সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত--জীবন জীবিকার তাগিদে-- একটি বহুতল ভবনে–– বাহির থেকে যার সদর দরজায় মস্ত বড় তালা––যেন হিটলার মুসোলিনীর শ্রম শিবির––ভিতরে কর্মরত নারী কয়েদি। তার পর হঠাৎ একদিন কোন না কোন কারণে সে ভবনে অগ্নিকাণ্ড–অতঃপর জীবন্তদগ্ধ হোয়ে অক্কা পাওয়া–জীবনের সকল স্বাদ-আহল্লাদ––বেচেঁ থাকার স্বপ্নসাধ ধূলায় মিশে যাওয়া। এহলো হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী গার্মেন্টস কারখানার দৃশ্যপট। কারা এ নারী শ্রমিক ? কোন বন্দীশালার কয়েদি? কোন দেশে এদের বসবাস? এদেশ কি স্বাধীন? এদেশে কি আইন আছে? আছে আইনের শাসন? এদেশের মানুষের কী বিবেক বোধ আছে? এ প্রশ্নগুলো আমাকে––একাত্তুরের একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে––একজন ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী হিসাবে–– কুরে কুরে খাচ্ছিল বিগত কয়েক দিন থেকে। গত ২৩ শে ফেব্রুয়ারী ২০০৬, চট্টগ্রামের কালুরঘাটস্থ কেটিএস নামক একটি গার্মেন্টেস সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডের মাধ্যমে উপরোক্ত ভয়াবহ-বীভৎস চিত্রটি আবারো আমাদের সামনে ভেসে ওঠল। তাই নিজেকেই প্রশ্ন করছি বারংবার––এই কি সেই দেশ, সেই বাঙলাদেশ– যার স্বপ্নে বিভোর হোয়ে আমরা সেদিন লড়াই করেছিলাম ? লক্ষ লক্ষ মা-বোন ইজ্জত দিয়েছিল? আমাদের প্রিয় নারী–আজকের নারী শ্রমিক– হাজার হাজার কোটি টাকা যারা উপার্জন করছে দেশ ও জাতির জন্য––তাদের রক্ত-ঘামের, কখনো কখনো ইজ্জতের বিনিময়ে––কী পাচ্ছে তারা? অগ্নিদগ্ধ হোয়ে জীবন বলিদান?

গত ২৩ শে ফেব্রুয়ারী ২০০৬, চট্টগ্রামের কালুরঘাটস্থ কেটিএস নামক একটি গার্মেন্টেস অগ্নিকাণ্ডের যে ঘটনা এতো নোতুন কোন ঘটনা নয়, বরং পুরানো ঘটনারই পুনরাবৃত্তি মাত্র । কেটিএস এ জীবন্ত দগ্ধ হোয়ে নিহত হয়েছে এ পর্যন্ত ৫৪ জন, আহত শতাধিক, নিখোঁজ ও সমসংখ্যক। মৃতের সংখ্যা আরো অনেক বেশী হবে বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের ধারণা। কারণ যারা পুড়ে ছাই হোয়েছে তাদের হিসাব এখানে নেই। তাই মাহবুবুল আলমের সে কালজয়ী একুশের প্রথম কবিতার ভাষায় আমারও বলতে ইচ্ছা করে –"কাঁদতে আসিনি– ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি।" এসব জঘন্য মুনাফালোভী লুঠেরা ধনিক গার্মেন্টস মালিকদের নরহত্যার অপরাধে ফাঁসি হওয়া উচিত। বিচার হওয়া উচিত দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তাদের, যাদের অবহেলা ও দুর্নীতির কারণে এসব কারখানা অনুমোদন পেয়েছে। কারণ এ কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, কেটিএস গার্মেন্টস এ যা ঘটেছে– এর পূর্বেও তা ঘটেছে বারংবার––সে ১৯৯০ সাল থেকে। যেমন––

২৭শে ডিস্বেবর ১৯৯০ সালে সারকা গার্মেন্টেস এ এভাবে জীবন্ত দগ্ধ হোয়ে মারা যায় ২৫ জন,

১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫ সালে প্রুটন গার্মেন্টস এ ৫ জন,

৫ ই আগস্ট ১৯৯৫ সালে লুসাকা ফ্যাশন গার্মেন্টস এ ৯ জন,

২৪শে জুন ১৯৯৬ সালে ট্রিমট ফ্রেন্স লিঃ এ্যান্ড সিনটেক্স গার্মেন্টস এ ১১ জন,

১৬ ই জুলাই ম্যাক্স বন্ড গার্মেন্টস এ ৯ জন,

৩০ শে জুলাই ১৯৯৭ সালে মিরপুর সাংহাই গার্মেন্টস এ ২৩ জন।

১৯৯৭ সালের ১৪ অক্টোবর তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠের ১ম পৃষ্টায় প্রকাশিত একটি রঙিন ছবি যে কোন বিদেশী "হরর" ছবির দৃশ্যকে হার মানাবে–যে দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে মিরপুরের জাহানারা ফ্যাশন লিমিটেড নামক গার্মেন্টেস এ সংঘটিত অগ্নিকান্ড থেকে জীবন বাঁচানোর জন্য মহিলা শ্রমিকেরা দড়ি বেয়ে দোতলা থেকে নামছে। পা ফসকে ঘটনাস্থলেই অক্কা পেয়েছে ১ জন, মারাত্মকভাবে আহত হোয়েছে ৫০ জন। মৃত্যুর এ মিছিল কিন্তু থেমে নেই। ২০০১ সালে মহাখালীর ডোরা গামেন্টস এ ১৬ জন, ২০০৫ সালে নরসিংদির বিসিক শিল্প নগরীতে চৌধুরী নিট ওয়ারে ৫১ জন, সাংহাই গার্মেন্টস এ ২৪ জন, রহমান এ্যান্ড রহমান গার্মেন্টস এ ৯ জন। মিরপুরের পাঁচতলা ভবন ধ্বসে স্পেক ট্রাম গার্মেন্টস এ কতলোক মারা গেছে তার সঠিক তথ্য এখনো পাওয়া যায়নি।

চলতি বছর ৭ই জানুয়ারী সান গার্মেন্টস এ ২৮ জন,

৯ই ফেব্রুয়ারী যমুনা স্পিনিং মিলে ৭ জন।

উপরোক্ত এতগুলো ঘটনার জন্য একজন গামেন্টস মালিকের সাজা হয়েছে এমন খবর আমাদের জানা নেই। কিন্তু কেন? এতো নিছক দুর্ঘটনায় মৃত্যু নয়; এতো অপরাধজনক নরহত্যা। দেশে প্রচলিত কারখানা আইনে শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য

ও নিরাপত্তা; ঝুঁকিপূর্ণ কাজ বিশেষভাবে অগ্নিকাণ্ডের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিশেষ বিধান সম্পর্কে বলা আছে। কারখানা আইন ১৯৬৫ এর চতুর্থ অধ্যায়ের ২২ ধারার উপধারা (১) হতে (৮) পর্যন্ত শ্রমিকদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিধানাবলী বর্ণিত আছে। উক্ত ধারার (১) উপধারায় বলা আছে--অগ্নিকাণ্ডের ক্ষেত্রে সংঘটিত হতে পারে এমন ধরণের বিপদ এড়ানোর ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে। উপধারা (২) এ বলা আছে পরিদর্শকের কাছে যদি মনে হয় যে, কোন কারখানায় (১) উপধারা অনুসারে বিপদ এড়ানোর ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি তবে তিনি নির্ধারিত তারিখের মধ্যে তার নির্দেশিত পন্থায় উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কারখানার ব্যবস্থাপককে নির্দেশ দিতে পারেন। উপধারা (৩) এ বলা হয়েছে- প্রতিটি কারখানার কোন ঘর থেকে বের হওয়ার দরজা তালাবদ্ধ বা শক্ত ভাবে আটকানো যাবেনা যাতে করে কোন ঘরের মধ্যে কোন লোক থাকা পর্যন্ত উক্ত দরজা যেন সহজে এবং সাথে সাথে ভেতর থেকে খোলা যায়---। তাছাড়া দৈনিক সর্বোচ্চ শ্রমঘন্টা, বিশ্রাম, সাপ্তাহিক ছুটি ইত্যাকার বিষয়গুলোও দেওয়া আছে সে কারখানা আইনের ষষ্ট অধ্যায়ের ৫০ ধারায়। কাজের সময় বলা আছে -সপ্তাহে সর্বোচ্চ ৪৮ ঘন্টা-দিনে ৯ ঘন্টার বেশী নয়। একই অধ্যায়ের ৬৫ ধারায় মহিলা শ্রমিকদের বেলায় বলা আছে-কোন কারখানায় কোন মহিলাকে সকাল ৭টা থেকে রাত ৮ টার মধ্যে ছাড়া অন্য কোন সময়ে কাজ করতে দেওয়া যাবেনা। অথচ এসব আইনের কোন তোয়াক্কা না করে মালিক-কর্তৃপক্ষ গার্মেন্টস শ্রমিকদের সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন কাজ করতে বাধ্য করে সামান্য ওভার টাইম ভাতার বিনিময়ে-- বলা বাহুল্য সে ক্ষেত্রেও তারা আইনের বিধান মানেনা। আইনে অতিরিক্ত কাজের ক্ষেত্রে দ্বি-গুণ ভাতার যে বিধান আছে সে ভাতাও পায়না গার্মেন্টস শ্রমিকেরা। সাপ্তাহিক ছুটিতে ও ওভার টাইম বাধ্যতামূলক। এসমস্ত আইন কারখানার মালিকেরা মানছে কিনা তা দেখার জন্য কারখানা পরিদর্শকের একটি দফতর আছে, কয়েক ডজন পরিদর্শক আছে, তার পরও মালিক কর্তৃপক্ষ এ সমস্ত আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠী প্রদর্শণ করে চলেছে। সরকার বিদেশী বিনিয়োগের দোহাই দিয়ে ইপিজেড গুলোতে শ্রম আইন অকার্যকর করে রেখেছে। বিদেশী আমদানীকারকদের চাপে ২০০৬ সালের মাঝামাঝি থেকে সীমিত ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার দিলেও অবস্থার কোন ইতর বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। বরং যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে তথাকথিত "অয়েল-ফেয়ার কমিটি"(WRWC) গঠন করা হোয়েছে, সেসব প্রতিষ্ঠানে চলছে নির্বিচার শ্রমিক ছাটাই--WRWC প্রতিনিধিদের হয়রানি করা হচ্ছে-বদলী ও চাকুরীচ্যুতির মাধ্যমে। কিন্তু ইপিজেড এলাকার বাহিরে যে সমস্ত কারখানা আছে সে সকল কারখানাগুলোতেও শ্রম আইন মানা হয়না। শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইন ১৯৬৫, কারখানা আইন-১৯৬৫, মজুরী পরিশোধ আইন ১৯৩৬, ক্ষতিপূরণ আইন-১৯২৩ এবং শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ-১৯৬৯ এসব কোন আইনই মানা হয়না শুধু গার্মেন্টসে নয়-- ব্যক্তিমালিকানাধী প্রায় সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানে। একটি স্বাধীন দেশে এটা কিভাবে সম্ভব? জবাব একটিই--যারা গার্মেন্টস শ্রমিক হিসাবে কাজ করে তারা এ সমাজের যেন ম্লেচ্ছ-অস্পৃশ্য। তাদের আবার জীবন! এ সমস্ত দুর্ঘটনায় যারা মারা যাচ্ছে তারা এদেশের দারিদ্রক্লিষ্ট নারী শ্রমিক। মধ্যবিত্ত-এমনকি নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীরা-- বিভিন্ন পেশায় গেলেও-- গার্মেন্টসে এখনো যায়নি। আমাদের সমাজের যারা হর্তা-কর্তা-বিধাতা তারা ধরেই নিয়েছেন এরা সমাজের আবর্জনা, সমাজের উন্নয়ন অগ্রগতির জন্য এরাতো জীবন দিবেই। এদের জীবনের বিনিময়েতো দেশ ও সমাজ এগুবে। এদের জীবনের দামতো এক লক্ষ টাকারও কম। তাই সবাই পার পেয়ে যাচ্ছে-পার পেয়ে যাবে। প্রধানমন্ত্রী হতে নেতা-নেত্রীরা--যারা আজ বিষাদ-মলিন মুখে ঘটনাস্থলে ছুটে যাচ্ছেন, ঘটনার নিন্দা জানাচ্ছেন, হতাহতদের প্রতি গভীর সমবেদনায় কাতর হচ্ছেন, সব লোক দেখানো--কেবল ভোটের রাজনীতি। তাই টিভি ক্যামেরা ছাড়া তারা কেউ সেখানে যাননা--ক্যামেরার ফ্লাশ না জ্বলা পর্যন্ত ত্রাণ দেননা। ফলতঃ এভাবে ঘটনা ঘটার পর কিছু দিন হৈ চৈ, অতঃপর সবকিছু ধীরে ধীরে ভুলে যাওয়া। রাষ্ট্র এখানে শাসক শ্রেণী তথা ধনিক শ্রেণীরই স্বার্থ রক্ষা করছে নির্লজ্জভাবে। অথচ এ দেশের স্বাধীনতার বেদিমূলে যারা জীবন দিয়েছে--সম্ভ্রম দিয়েছে-- তাদের সিংহভাগতো এ দরিদ্র জনগোষ্ঠী। জানি--এখনো হয়ত কিছুই হবেনা। সময়ের প্রবাহে সবকিছু ভুলে যাবে সবাই। সবকিছু আবার চলবে স্বাভাবিকভাবে। কারণ এখানে 'প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে, বিচারের বাণী নীরবে-নিভৃতে কাঁদে'। তবুও দাবী করব--এ ভীবৎস গণহত্যার বিচার চাই। ফাঁসি চাই সংশ্লিষ্ট সকল অপরাধীদের।

*সভাপতিঃ বাঙলাদেশ অয়েল এ্যান্ড গ্যাস ওর্য়ার্কার্স ফেডারেশন ও ইস্টার্ন রিফাইনরী এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন।